ঘোড়সওয়ার মেয়েটি

[নভেলা]

ঘোড়সওয়ার মেয়েটি

হাসনাত আবদুল হাই

বেঙ্গলবুকস

প্র কা শ ক
মাহমুদুল হাসান
বেঙ্গলবুকস
নোভা টাওয়ার, ২/১ নয়া পল্টন, ঢাকা ১০০০
বিশাল বুক কমপ্লেক্স, ৩৭ নর্থব্রুক হল রোড, বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০
ফোন : +88 01958519882, +88 01958519883

পরিবেশক : কিন্ডারবুকস, বেঙ্গলবুকস

বইটির কোনো অংশ বা সম্পূর্ণ বই কম্পোজ বা ফটোকপি আকারে বিক্রয় বা সরবরাহ অবৈধ। এ বইয়ের কোনো লেখা বা চিত্র হুবহু, পরিমার্জন বা পরিবর্ধন করে ছাপানো, এমনকি কোনো ইলেক্ট্রনিক যন্ত্রের মাধ্যমে সংরক্ষণ করা কপিরাইট আইন, ২০২৩ অনুযায়ী দণ্ডনীয়।

ISBN : 978-984-683-003-3

www.bengalbooks.com.bd
email : info@bengalbooks.com.bd

ঘো ড় স ও য়া র মে য়ে টি
হাসনাত আবদুল হাই

প্রথম প্রকাশ : অমর একুশে বইমেলা ২০২৫
কপিরাইট © লেখক
প্রচ্ছদ : রাজীব দত্ত
বর্ণবিন্যাস ও কম্পিউটার গ্রাফিক্স : ক্রিয়েটিভ ডিজাইন এন্ড ডেভেলপমেন্ট
মুদ্রণ : কমলা প্রিন্টার্স, ৪১ তোপখানা রোড, সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০
অনলাইন ডিস্ট্রিবিউটর : রকমারি ডট কম, বাতিঘর ডট কম
ভারতে পরিবেশক : ধ্যানবিন্দু, কলেজ স্ট্রিট, কলকাতা
যুক্তরাজ্য পরিবেশক : সংগীতা লিমিটেড, ২২ ব্রিকলেন, লন্ডন
যুক্তরাষ্ট্র পরিবেশক : মুক্তধারা, জ্যাকসন হাইটস, নিউইয়র্ক

মূল্য : ২৬০ টাকা

Ghorsoar Meyeti
by Hasnat Abdul Hye

First published in hardback in Bangladesh by BengalBooks in 2025
Text Copyright reserved by the Writer

Printed and bound in Bangladesh

উৎসর্গ

রওনক আফরোজ

কেরোসিন তেল শেষ হয়ে এলে হারিকেনের আলো হালকা হতে হতে ঘরে অন্ধকার নিয়ে আসার মতো কমলার চোখের সামনে বিকেলের আলো ফুরিয়ে সামনের পুকুর, তার ওপাশে চষা ক্ষেত, বাঁদিকের বাঁশঝাড়ে সন্ধ্যা নেমে এলো। কমলা শেষ বিকেল থেকে পুকুরপাড়ে তালগাছটার নিচে ঠেস দিয়ে বসে ডানদিকে দূর থেকে এঁকেবেঁকে আসা মেঠোপথের দিকে তাকিয়ে। সেখান দিয়ে হাটের মানুষ ফিরতে শুরু করেছে একজন দুজন করে। বিকেলের ছায়া যখন উঠোনে বড় হয়ে গোয়াল ঘরের দিকে গিয়ে পৌঁছেছে, এই সময় চই চই শব্দ তুলে সে পুকুর থেকে হাঁসগুলো বাড়িতে এনে খোঁয়াড়ে ঢুকিয়ে মাকে চেঁচিয়ে বলেছে, মা হাঁস-মুরগি সব আনিছি। এখন পুকুরপাড়ে যাই।

কমলার মা রমিজা পাকের ঘরে উনুনের সামনে বসে নাড়ার আগুনের ধোঁয়ায় ভিজে আসা চোখ মুছতে মুছতে বলেছে, সেখানে কী করতি যাস? পড়তে বসবি নে? সামনে পরীক্ষা।

পড়বো নে, এহনো সন্ধ্যা হয় নাই। দেহি বাজান হাট থে আসে নাকি।

পাকঘর থেকে কমলার মা বলে, যখন আসবার আসপে। গিয়ে দেখবার কী আছে? তারপর নিজের মনে স্বর নামিয়ে বলে, মেয়ে আমার বাপের বড় ন্যাওটা। খালি বাপ বাপ করে। ছোট থাকতি যেমুন ছিল, বড় হলিও একই রকুম। সঙ্গে সঙ্গে ঘুরতি চায়। বাপটাও বড় লাই দেয় মেয়েকে। মেয়ে বলতি পাগল।

কমলা বাপের সঙ্গে বাজারে যায়, মাঠে যায় লাঙল ধরতে, বাঁশঝাড়ে ঢোকে বাপকে মুলিবাঁশ কাটায় সাহায্য করতে। লাফ

দিয়ে পুকুরে নামে বাপের ফেলা জাল একপাশে টেনে মাছ ধরার সময়। উঠোনে ধান মাড়াইয়ের কাজে যখন জমির আলি ধান একপাশে জড়ো করে সে গরু দাবড়ায় হাতে ছড়ি নিয়ে। ছেলে হলে যা যা করত বাপের সঙ্গে থেকে, কমলা মেয়ে হয়ে সবই করে। এতে তার মা মাঝে মাঝে বেজার হলেও তার বাবা জমির আলি খুশি হয়। হেসে বলে, মাইয়া আমার খুব কামের। কিছু কতি হয় না তারে। নিজেই বোঝে কহন কী করা লাগপে।

শুনে কমলার মা বলেছে, তাতি কি মাইয়াটার ভালো হতিছে?

ক্যান খারাপটা কী দেখতি পালা? খাবার সময় থালায় ভাতের সঙ্গে সালুন মাখতে মাখতে জমির আলি হেসে জিজ্ঞাসা করেছে।

পুরুষালি স্বভাব হয়ি যাতিছে, টের পাও না?

পুরুষালি স্বভাব, মেয়েলি স্বভাব—এইসব আমাদের অভ্যাসের কথা। আমরা এমুন ভাবি বলিই এই কথা কই। অভ্যাস চলি গেলি এমন চিন্তা মনে আসপে না।

অভ্যাস? অভ্যাস বলতি কী কতিছ কমলার বাপ? কমলার মা রমিজার স্বরে অবাক হওয়ার ভাব।

কতিছি, সমাজ পুরুষদের লাগি এক রকুম আর মেয়েদের লাগি অন্যরকুম আচার-ব্যবহার ঠিক করি রাখিছে বলি তাদের আলাদা করি দেখবার অভ্যাস হয়ি গেছে। এক সময় এডা বেশ চলতি পারতো, যেমন আমাদের মা, নানি-দাদিদের সময়। কিন্তু এহনো চলতি হবি—এডা কওয়া যায় না। উচিত না।

ক্যান কওয়া যায় না? আমাদের বেলায় কওয়া গেলি এহন কলি ক্ষতি কী? কমলার মায়ের স্বরে উষ্মা।

কমলা স্কুলে যায়। তুমি যাও নাই। তুমার বেলা যেইডা নিয়ম ছিল হের বেলায় তা হতি পারে না। এই সহজ ব্যাপারডা বোঝো না ক্যান? খালি বকবক করো।

একই ঘরের মাঝখানে বেড়া দিয়ে ভাগ করা দুটো শোবার ঘর আর খাবার ঘর। পড়ার টেবিল তাদের শোবার ঘরে, যেখানে হারিকেনের আলোয় পড়তে বসে কমলা আর তার ছোট ভাই রাজু। কমলা কান খাড়া করে খাবার ঘরে বাবা-মায়ের আলাপ শোনে। শুনতে শুনতে সে হাসে। তাকে নিয়ে এমন আলাপ প্রায়ই শোনে সে। শুনে মজা পায়। মা যে তার বাইরে ঘুরে বেড়ানো পছন্দ করে না, এতে সে অবাক হয় না। এর জন্য তার ওপর রাগও হয় না। সে বোঝে, মা তার ভবিষ্যৎ নিয়ে চিন্তা করে অন্য মায়েদের মতো। সংসারে সব মা একইভাবে দেখে নিজের মেয়েদের। কিন্তু বাবা অন্যরকম, অন্য স্বভাবের। অনেক দিক দিয়েই তিনি অন্যদের চেয়ে আলাদা, যেন আরেক জগতের মানুষ। তিনি সংসার করেন, কিন্তু তার মধ্যে অন্য একটা ভাব আছে। যেন বৈরাগী ফকির আর সংসারীর মধ্যে একজন। বৈরাগীদের সম্বন্ধে কমলার ধারণা হয়েছে ফকিরদের আখড়ায় গিয়ে, তাদের জীবনের হালচাল দেখে। এ কথা সে বলছে না, আমি লেখক বলছি; কেননা অনুভব করলেও কমলার এইসব নিগূঢ় ব্যাপার বিশদভাবে বুঝবার বুদ্ধি হয়নি এখনো।

মাঝে মাঝে সন্ধ্যার পর বাবা তাকে নিয়ে ফকিরদের গানের আসরে যান। গান শুনতে শুনতে কমলা চারদিক তাকিয়ে দেখে। ঘরের ভেতর মেঝেতে কাঁথা-চাদর পাতা কিন্তু বালিশ নেই। এক কোণে কয়েকটা বাসনকোসন আর অ্যালুমিনিয়ামের হাঁড়ি-পাতিল। কয়েকটা পুঁটলিতে একপ্রস্থ পরার কাপড়। গানের আসরের জন্য ফকিররা পরে আছে সাদা লুঙ্গি, হাফ হাতা ফতুয়া, গলায় ঝুলছে গামছা। পোশাকে যা রঙচঙ সে শুধু তাঁদের গামছায়। কীভাবে চলে ওদের? তার প্রশ্ন শুনে বাবা বলেছে, আল্লাহই চালান। তারা যে ভিক্ষে করে চলে, এ কথা বলে না সে। কমলা অবশ্য দেখেছে, বাবা গান শোনার আগেই ফকিরদের মুরুব্বিকে দিয়েছে এক পোঁটলা ভর্তি চাল-ডাল। যে টিনের ঘরে কয়েক দিনের জন্য তারা মেহমান, সেখানে

দাওয়ায় লাউ, কলা, বেগুন—এইসব সবজি চোখে পড়েছে তার। সে বুঝতে পেরেছে, তার বাবা যেমন চাল-ডাল নিয়ে এসেছে, অন্যরা দিয়েছে শাক-সবজি। হয়তো তেল নুন মসলাপাতি এভাবেই জুটেছে এদের। কমলা বুঝেছে, এটাও এক ধরনের বেঁচে থাকা।

ফকিরদের আখড়া থেকে বাড়ি ফিরে এসে মায়ের কাছে এটা-ওটা বলে অজুহাত দেয় বাবা। তাতে মা শান্ত হয় না, মিথ্যেটা ধরে ফেলে। এতদিনে তার বাবার স্বভাব মায়ের চেনা হয়ে গিয়েছে। অভ্যাসমতো কিছুক্ষণ নিজের মনে গজগজ করে, বকাঝকা করে কমলাকে। বলে, ধিঙ্গি মেয়ে এত রাতে বাড়ির বাইরে থাকলি পর মাইনষে কবে কী? কিন্তু তার আসল রাগ বাপের ওপর। শেষমেশ তাকেই বলে, মাইয়াডার ভবিষ্যৎ ঝরঝর করি ফেলতিছ। শেষে আমারে দোষ দিবা না।

কমলা গ্রামের স্কুলে ক্লাস সেভেনে পড়ে। বয়স বারো-তেরো হবে। এই বয়সে একটা মেয়ে ধিঙ্গি হয় কী করে তা কমলার মাথায় আসে না। ধিঙ্গি হওয়ার মানেটাই সে পুরোপুরি বুঝে উঠতে পারেনি এখনো। ক্লাস ফোরে পড়া ছোট ভাই রাজুর স্বভাব বোনের উলটো। সে ঘরকুনো, সব সময় মায়ের কাছে ঘুরঘুর করে। এতে তাদের মা খুব খুশি হয় না। বরং বিরক্ত হয় আর সেটা বের হয়ে আসে কমলার ওপর মেজাজ খারাপ করে বকাঝকার সময়। ছেলের ঘরকুনো মেয়েলি স্বভাবের জন্য শেষ পর্যন্ত রাগটা কমলার বাবা জমির আলির ওপর দিয়েই যায়। মেয়ের বদলে ছেলেকে নিয়ে ঘোরে না কেন তার বাবা, সে কথা বলে তার মা। রাজুর যে বাইরে যাওয়ার মতো বয়স হয় নাই, সে কথা মা মনে হয় বোঝে না।

কমলা অবসরের সময় মাঝে মাঝে রাজুকে নিয়ে বাইরে যায়, জোর করেই নিয়ে যায়। গাছে উঠে পাখির বাসায় ডিম খোঁজে, বাচ্চা দেখতে পেলে রাজুকে ওপরে উঠে আসতে বলে

দেখার জন্য। রাজু ভয়ে গাছে ওঠে না। বলে, তুমি কও কেমুন দেখতি তারা।

শুনে কমলা মুখ ভেংচে বলে, আমি দেখলি আর সেডা বললি পর তোর দেখা হবি? কী যে কতিছিস তুই! মা ঠিকই কয়, তোরে দি কিছু হবি না।

শুধু গাছে উঠে পাখির ছানা দেখার সময় না, ডালে বসে পাকা কাঁঠাল ভেঙে খাওয়ার সময়ও সে রাজুকে ওপরে উঠে আসতে বলে। কিন্তু রাজুর ভয় কাঁঠালের গন্ধেও যায় না। কী আর করা, নিজে খাওয়ার পর পাকা কাঠালের কয়েক কোয়া সে রাজুর জন্য নিয়ে আসে। বলে, ডালি বসি কাঁঠাল খাওয়ার সোয়াদই আলাদা। তুই টের পালি না বোকা হাঁদারাম।

রাজু কাঁঠাল খেতে খেতে বলে, বড় হলি উঠপোনে।

শুনে কমলা হাই তুলে বলে, তোর বড় হওয়া হবি না। বড় কি কেউ এক লাফে হয় বুদ্ধু? একটু একটু করি হয়।

রাজু বলে সেডা ক্যামুন? একটু একটু করি বড় হয় ক্যামনে?

ক্যান, আমারে দেহি বোঝোস না? আমার লাহান বড় হবি।

রাজু বলে, তুমি তো মাইয়া। তোমারে দেহি আমি বড় হবো ক্যামনে? আমি তো পোলা।

কমলা হেসে বলে, আরে, আমি তো পোলাদের মতোই বড় হতিছি। শুনিস না মা কী কয়? ক্যান আমারে বকেঝকে?

রাজু বলে, বকছিল তুমি পোলাদের লগে পুকুরে সাঁতার কাটিছিলা বলে।

হাঁ, মা তাকে এই কয় মাস আগে খুব বকেছিল স্কুলের স্পোর্টসের সময় পুকুরে ছেলেদের সঙ্গে সাঁতার প্রতিযোগিতায় অংশ নেয়ায়। কমলা তার বাপের কথামতো লুকিয়ে রেখেছিল সাঁতার কাটার ব্যাপারটা। কিন্তু এক কুটনি পড়শি এসে বলে দেয়ায় জেনে যায়। প্রাইজ নিয়ে বাড়ি ফেরার পর যেন কেয়ামত শুরু হয়। এত বকুনি সে আগে কখনো শোনেনি। যতই সে হাতের প্রাইজটা দেখিয়ে শান্ত আর খুশি করতে চেয়েছে, তার মা

তেলে-বেগুনে জ্বলে উঠে বলেছে, যাও, ওটা ধুয়ি বাপের লগে মনের সুখে খাও।

রাজু সে কথাই বলেছে। সে মা যা বলে সব শুধু মনে রাখে না, তাতে সায়ও দেয়। তাতে যে মা তার ওপর খুব খুশি হয়, তা না। বরং উলটো রাগ করে মনে হয়। তার মা চায় কমলা তার কথায় সায় দেবে, কিন্তু সেটা হয় না দেখে তার রাগ বাড়ে। রাগের ঝাল মা রাজুর ওপর দিয়েই মেটায়। কমলা যেন নাগালের বাইরে, তাকে ধরা যায় না। কিছু বললে এক কানে শুনে অন্য কান দিয়ে বের করে দেয়।

তাল গাছের নিচে বসে বসে কমলার মনে এইসব কথা আসে। লেখক হিসাবে আমি এইসব কথা জানিয়ে দিচ্ছি যেন সবাই তার সম্বন্ধে একটা ধারণা করতে পারে। আমি যেমন সব চরিত্রের ভেতর আর বাইরের খবর রাখি অন্যেরা তা পারবে কেমন করে? তারা কি আমার মতো সব চরিত্রকে চেনে? সব চরিত্র মানে কমলা, তার বাবা, মা আর তার ছোটভাই রাজু। এরপর অন্য চরিত্রেরা আসবে, তখন তাদের কথা বলা যাবে। এখন বোঝা যাচ্ছে না কে কে আসতে পারে। গল্পে যারা আসে তাদের কয়েকজনকে আমিই ডেকে আনি আমার পছন্দমতো। আবার এমন চরিত্রও এসে যায় যাদের ডাকবো বলে ভাবিনি। তারা নিজেরাই আমার ইচ্ছা বা অনুমতি ছাড়া এসে যায়। অনাহূত বলে তাদের ফিরিয়ে দিতে পারি না। তাদেরকেও বসতে দিই, তাদের কথা শুনি। দেখা যায় আমি তাদের না চিনলেও আমি যেসব চরিত্রের কথাবার্তা শুনছি তাদের সঙ্গে উটকো অতিথিরা বেশ মিশে যাচ্ছে। তারা যে একে অন্যের অপরিচিত, এ কথা মনেই হয় না। তো, এমন চরিত্রেরা আসবে, কখন আসবে তা বলা যাচ্ছে না। সে যাই হোক, যে গল্পের শুরু সেখানে, যারা প্রধান চরিত্র তারা সময়মতো এসে গিয়েছে। এখন তাদের কথাবার্তা শোনা যাক, তাদের আচরণ দেখা যাক।

যারা গল্প বলেন, মানে লেখেন তাদের উদ্দেশ্যে বিজ্ঞজনরা যা বলেছেন আমি কিন্তু এইসব কথা বলে বেশ অমান্য করছি। তারা বলেছেন এত প্যাঁচাল না পেড়ে, দেখাও কী হচ্ছে। কিছু বলতে যেয়ো না। গল্পের কথকতায় এই কথা বেদবাক্য হয়ে গিয়েছে। অনেক পণ্ডিত এই জ্ঞান বিতরণ করে মাথার চুল পাকিয়ে ফেলেছেন। তাদেরকে আর না রাগিয়ে দেখানো যাক কী হচ্ছে এখন, কী বলছে চরিত্রগুলো। হা হা, পণ্ডিতরা ঘোরেন ডালে ডালে, আমি ঘুরি পাতায় পাতায়! কে কী বলবে সেটাও তো আমিই প্রম্পট করে দেবো থিয়েটারে যেমন হয়, সেইভাবে।

কমলা শেষ বিকেল থেকে তাদের পুকুর পাড়ে তাল গাছটায় হেলান দিয়ে প্রথমে দাঁড়িয়ে ছিল, দেখছিল পুকুরের ডান দিকের কাঁচা রাস্তা দিয়ে কারা আসে। ওই পথ দিয়েই তার বাবা ফিরবে হাট থেকে, কিন্তু তার ফিরতে দেরি হচ্ছে। দাঁড়িয়ে থাকতে থাকতে কমলার পা ধরে গিয়েছে, ঝিনঝিন ধরেছে। ঠিক সন্ধ্যার মুখে সে আর দাঁড়িয়ে থাকতে না পেরে তাল গাছের গোড়ায় বসে পড়লো। মাথার ওপর তালগাছের পাতা থেকে ঝুলতে থাকা খড়কুটোর বাসায় বাবুই পাখিরা তখন ঢুকে গিয়েছে। অন্য পাখিদের মতো বাবুই হইচই করে না, বেশ শান্তশিষ্ট। যে নিপুণভাবে তারা বাসা বানায় তা দেখে কমলার অবাক হওয়া শেষ হয় না। তালগাছের কাছে গেলে তার চোখ আপনা থেকেই ওপরে চলে যায়। মাথা উঁচু করে দেখতে দেখতে হাঁটার সময় কয়েকবার হোঁচট খেয়ে পড়ার মতো হয়েছে তার। তারপরও অভ্যাসটা যায়নি। আজ অবশ্য বিকেলে এখানে এসে দাঁড়ানোর পর বেশ কয়েকবার মাথা উঁচু করে বাসাগুলো দেখেছে সে। অগ্রহায়ণের বাতাসে দুলছিল হালকা-পলকা বাসাগুলো, দু-তিনটা বাবুইকে ধীরেসুস্থে তাদের বাসায় ঢুকতে দেখেছে সে। শুধু পাখি কেন আর কোনো জীব-জন্তু এমন সুন্দর

বাসা তৈরি করে তার ভেতর শীত, গ্রীষ্ম, বর্ষায় থাকে বলে সে শোনেনি, বইতেও পড়েনি। সন্ধ্যার আগে পুব আকাশে একাদশীর চাঁদ উঠলে সবকিছু মায়াময় হয়ে গেল। খুব দূরে না হলেও ধারে কাছে চাঁদের আলোয় যে সব দেখা যায় তার মধ্যে বাবুইয়ের বাসাও আছে। সে পথের দিকে তাকিয়ে থাকার ফাঁকে কয়েকবার ওপরে তাকিয়ে দেখেছে আর ভেবেছে তার মতো চঞ্চল মানুষ কি অমন সুন্দর বাসা তৈরি করতে পারবে? স্কুলের পড়ায় মনোযোগ না থাকলে মনে হয় ভালোভাবে কিছুই তৈরি করা যায় না। এজন্যই কি তাকে নিয়ে মায়ের এত দুশ্চিন্তা? ভাবার পরই সে মনে মনে হাসলো। কী চিন্তা থেকে কোথায় এসে গেল!

একটু পর রাজু এসে বললো, মা বাড়ি যাতি কয়িছে। অনেক রাইত হয়িছে এহন।

কমলা বললো—দূর বোকা, অনেক রাইত হবি ক্যান? সবে সন্ধ্যা হয়িছে। তারপর চারদিক তাকিয়ে সে বললো, দেখ সবকিছু কেমুন সোন্দর দেখায়। আকাশে চাঁদ উঠিছে।

রাজু মুখস্থের মতো আবার বলে, মা বাড়ি যাতি কয়িছে।

কমলা বলে, বস। বাপ এহনি আসপে। বলদ কিনি আনবে। দূর থিকাও দেখতে পাবি। এইডা তো কোরবানির সময় না, হাটে গিয়া কয়জন গরু-বলদ কেনে? বলদ সামনে নিয়া কেউ আসতিছে দেখলেই বুঝবি বাপ আসতিছে।

রাজু বলে, মা কয়িছে সন্ধ্যার সময় সাপখোপ বার হয়। তোমারে যাতি কয়িছে।

কমলা বলে, ওই যে কালু চাচারে দেখা যায়। মিনে হতিছে তিনিও হাটে গিছিলেন। খাঁড়া, তাঁরে জিগায়া লই।

কালু শেখ তাদের পড়শি, দুই বাড়িতে যাওয়া আসা আছে। তাঁর বড় ছেলে জসিম কমলার সঙ্গে একই ক্লাসে পড়ে। তিনি একটা ব্যাগ হাতে কাছে আসতেই কমলা উঠে দাঁড়িয়ে সালাম দিয়ে বললো, চাচা মনে লয় হাট থিকা আসতিছেন। বাপজানও

হাটে গেছেন। দেখিছেন তারে?

কালু শেখ বলেন, একবার দেখিছি, গরু-বলদের বাজারে যাচ্ছে কলেন। তারপর আর দেখি নাই। বলদ কিনবার গিছে বুঝি? আমারে তো কয় নাই। তা তোমরা ভাই-বোনে কী করো এহানে?

কমলা বলে, বাপের লাগি খাড়ায়া আছি। তারপর বলে, বলদ দেখতি।

কালু শেখ বলে, বলদ আবার কী দেখপা? সব বলদ সমান। একই তাদের বুদ্ধি। বোঝলা? যাও, খাড়ায়া না থিকা বাড়ি যাও। বাপ যহন আসবার আসপেনে।

বলে তিনি চলে যেতে যেতে বিড়বিড় করে কিছু বলেন। কমলা জানে তাদের হালের বলদ মরে যাওয়ার পর বাবা অন্যের বলদ এনে জমি চাষ করেছে আমন মৌসুমে। সব সময় পাওয়া যায়নি, কেননা তাদের নিজেদের জমিতে চাষের কাজ চলছিল একই সময়ে। অন্য পড়শিরা দু-একবার দিলেও কালু চাচা দেয়নি একবারও। তাদের বাবা টাকা কর্জ করে বেশ জেদ নিয়ে হাটে গিয়েছে বলদ কিনতে। সেই বলদ দেখার জন্য বিকেল থেকে এই পর্যন্ত অপেক্ষা করছে কমলা। তার ভেতরে অনেক উত্তেজনা কিন্তু রাত হয়ে যাওয়ায় সে একটু চিন্তিত হয়ে পড়েছে। সে রাজুর দিকে তাকিয়ে বললো, তুই বাড়ি যা। মারে গিয়া ক আমি আসতিছি।

কিন্তু রাজু যায় না। গোঁয়ারের মতো দাঁড়িয়ে থেকে বলে, মা কয়িছে তোমারে নিয়ে যাতি। একা গেলে আমারে বকবেনে।

কমলা বলে, তা হলি কিছুক্ষণ থাক। বাপ আর কত দেরি করপে? আসি যাবে শিগগির।

কিছুক্ষণ না, অনেকক্ষণ উত্তেজনা আর আশঙ্কা নিয়ে দাঁড়িয়ে থাকার পর কমলার মনে হলো তার বাপের মতো কেউ একজন আসছে, সামনে বলদ নিয়ে। সে আনন্দে লাফিয়ে উঠে বলে, ওই যে বাপ আসতিছে। বলদ কিনিছে! দেখিস না সামনে হাঁটায়ে আনতিছে।

উত্তেজনায় সে চঞ্চল হয়ে ওঠে। বলদ দেখার জন্য তার আর তর সয় না।

রাজু চোখ সরু করে বলে, ইটা কেমুন বলদ? মাথায় শিং নাই দেখি।

কমলা বকুনি দিয়ে বলে, কী কথা কতিছিস? বলদের শিং থাকপে না ক্যান? তোর দেখার ভুল। ভালো করি দ্যাখ।

বলে সে নিজেও চোখ সরু করে দেখে। সত্যিই তো! বাপজান যে বলদ হাঁটায়ে আনতিছে তার মাথায় শিং দেখা যায় না। সে আর দাঁড়িয়ে না থেকে দৌড়ে যায় তার বাপের দিকে। হাঁপাতে হাঁপাতে কাছে গিয়ে দেখে সত্যিই বলদের মাথায় শিং নেই। মুখটাও যেন কেমন অন্যরকম। গায়ের বাদামি রঙ একাদশীর আকাশের নিচে কালচে দেখায়। একটু পর তার চোখে পড়ে তার বাবা আর বলদ দুজনই খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে হাঁটছে।

কমলা একটু দম নিয়ে বলে, বাবা, বলদের শিং নাই ক্যান?

জমির আলি হেসে বলে, এইডা ঘোড়া। ঘোড়ার কি শিং থাকে? কী কতিছিস পাগলি?

অবাক হওয়ার পালা শেষ হলে কমলা বলে, তোমরা দুজনেই এমুন করি হাঁটতিছ ক্যান?

জমির এদিক ওদিক তাকিয়ে স্বর নামিয়ে বলে, নৌকার ফেরি উল্টি গিছিল পাড়ের কাছি আসি। নিচে পড়ি গিছিলো ফেরি নৌকার সবাই। আল্লার রহম যে মাঝ নদীতে ডোবে নাই। রাজু কমলার পিছনে পিছনে দৌড়ে এসেছিল। বাবার কাছে এসে শেষের কথাগুলো শুনতে পায় সে। শুনে আর দেরি না করে বাড়ির দিকে, 'বাপ ঘোড়া কিনিছে, ঘোড়া কিনিছে' বলে চিৎকার করতে করতে দৌড় দেয়।

তাকে দৌড়ে যেতে দেখে জমির বলে, তোর মায়েরে খবরডা দিতি গেল পোলা। ফেরি ডুবির কথা না কলিই হয়।

কমলা হেসে বলে, তুমিও যেমন। এইডা কি লুকিয়ে

রাখপার খবর? ফেরি নৌকা তো তোমার দোষে উল্টি যায় নাই।

জমির আলি যেন মনে সাহস পেয়ে বলে, হা, তা হয় নাই। কিন্তু তোর মায়েরে তো চিনিস। সবকিছুতে আমার দোষ খুঁজি বার করে। এহানেও যে করবে না তা কেডা কতি পারে? কবে, হাটে গিয়া দেরি করলা ক্যানে? দেরি না হলি সন্ধ্যার আগে আসি পৌঁছাইতা। তারপর খুঁড়িয়ে হাঁটতে হাঁটতে জমির বলে, তুই যেমুন বুঝতে পারলি, তোর মা কি এমুন করি বুঝবে নে? যাই হোক, ঘোড়ার তেমন ক্ষতি হয় নাই। দুদিনেই সারি উঠপে।

কমলা চিন্তিত হয়ে বলে, তোমার পা? বড় কিসিমের জখম হয় নাই তো? উপজেলা ডাক্তাররে গিয়া দেখায়ে আইসো আগামী কাল।

জমির খোঁড়াতে খোঁড়াতে বলে, এমুন কিছু হয় নাই। পানিতে ভিজি ঠান্ডা লাগতিছে। রাতে জ্বর না আসে।

পাশে হেঁটে যেতে যেতে কমলা বলে, এখন একবার আর শোবার আগে একবার গরম পানিতে কাগজি লেবুর রস মিশায়ে খায়ি নিবা। তা হলি জ্বরটর কিছু হবি না।

শুনে জমির হেসে বলে, তুই দেহি ডাক্তার-কবরেজদের মতো কথা কতি শিখেছিস। আচ্ছা তাই করবো নে। বাড়িত পৌঁছে আগে জামাকাপড় বদলায়ে নিতি হবি। মনে হয় যেন এহনো ভেজা।

কথা বলতে বলতে তারা পুকুর পাড়ে ওঠে। একাদশীর চাঁদ তখন তালগাছের মাথায় ঢাকা পড়েছে। দেখা না গেলেও তার আলোয় পথ দেখে বাপ-মেয়ে বাড়ির সামনে এসে যায়। জমির বলে, তোরা দুজন কি অনেকক্ষণ আমার লাগি অপেক্ষা করছিলি পুকুর পাড়ে?

বাড়ির সামনে বেড়ার দরোজা দুদিকে সরিয়ে কমলা বলে, অনেকক্ষণ আর কই? এই তো কিছুক্ষণ হলো।

উঠোনে ঢুকতে ঢুকতে জমির মেয়েকে বলে, ফেরি উল্টি

যাবার কথা তোর মায়েরে কবি না। মনে থাকে যেন।

রমিজা রাজুকে নিয়ে উঠোনেই দাঁড়িয়ে ছিল তাদের দুজনের অপেক্ষায়। জমির ঘোড়া নিয়ে সেখানে পৌঁছাতেই সে বললো, এত দেরি করলা ক্যান? কমলা সেই বিকাল থিকি তোমার পথ পানে চায়ি পুকুর পাড়ে বসি ছিল। আমি রাজুরে পাঠালাম ডাকি আনতি। কিন্তু তোমার মাইয়া কি সে কথা শোনে। বসিই থাকলো এক ঠায়।

শুনে জমির ঘুরে কমলার দিকে তাকালো। কমলা তখন খুব মনোযোগী হয়ে ঘোড়ার গায়ে হাত বোলাচ্ছে।

রমিজা ঘোড়ার দিকে তাকিয়ে বলে, হাটে গেলা বলদ কিনতি। ফিরা আলা ঘোড়া নিয়া। বৃত্তান্তডা কী?

জমির বলে, বলদের দাম তিরিশ হাজারের নিচে নাই। অত টাকা পাবো কনে? তাই ঘোড়াই কিনি ফেললাম।

ঘোড়া দিয়া কি চাষের কাম হবি?

হবি, খুব হবি। গ্রামে কয়েকজনে করতিছে না? খুব ভালোভাবে করতিছে। জানি-বুঝিই তো কিনলাম আমি। আরেকডা সুবিধা কি জানো কমলার মা?

কী?

যহন চাষের কাজে লাগবি না, মাল টানতি পারবে। ভাড়ায় খাটাতি পারবো। তাতে দুইডা পয়সা আসপে। তারপর ধরো গে আমি বাজারে-গঞ্জে হাঁটি না গিয়া ঘোড়ায় চড়ি যাবানে। সময় কম লাগপে আর আমার মেন্নতও কম হবি। ঘোড়ায় অনেক লাভ। সব হিসেব করিই কিনিছি।

কমলা তার কথা শুনে বলে, তুমি ঘোড়ায় চড়বা? জানো ক্যামনে চড়ে?

জমির হেসে বলে, শিখি নিবানে। এ আর শক্ত কী কাজ? গ্রামের যারা চড়ে তাদের কাউরে কবো একটু শিখায়ে দিতি।

রমিজা বলে, বেশ, সে সব পরে দেখা যাবেনে। এহন ঘরে গিয়া জামা-লুঙ্গি বদলাও। ধুলাবালিতে চেনা যায় না। তারপর

বলে, খুব বেশি চোট পায়িছো?

চোট, কীসের চোট? জমির ভালো মানুষের মতো স্ত্রীর দিকে তাকায়।

রমিজা পাকঘরের দিকে যেতে যেতে বলে, ফেরির নৌকা উল্টি গিছিল। তোমরা ডাঙ্গার কাছে পড়ি গিছিলা। কথা লুকাও ক্যানে? রাজু সব কয়িছে আমারে।

জমির দেখে রাজু মায়ের শাড়ির আড়ালে মুখ লুকাচ্ছে। না, ছেলেটাকে যত বোকা ভেবেছিল আদপে সে রকম না। বুদ্ধি রাখে, বিশেষ করে তাকে বিপদে ফেলাবার বুদ্ধি।

রমিজার দিকে তাকিয়ে জমির বলে, সেডা এমুন কিছু না। এতটা পথ তো হাঁটিই আলাম। কোনো কষ্ট হয় নাই।

রমিজা পাক ঘরের দিকে যেতে যেতে বলে, কষ্ট হয় কি না সেডা রাতে শোবার পর বুঝতি পারবা। ঘুমাবার আগে আমি হলুদ গরম করি পায়ে লাগায়ে দেবানে।

ঘোড়াটা গোয়াল ঘরে নিয়ে বেঁধে রাখে কমলা। লেবুর গরম পানি বাবাকে দেবার সময় সে জিজ্ঞাসা করে, ঘোড়ার জন্যি খাওয়া দিতি হবে না বাবা?

তা তো দিতি হবে। না খালি বাঁচপে ক্যামনে?

ঘোড়া কী খায়? কমলা জিজ্ঞাসা করে।

জমির বলে, ঘাস খায়। ব্যাগের মধ্যি নিয়া আইছি। খুলি খাতি দে। কাল থিকি মাঠের ঘাস খাওয়াতে নিয়ে যাবানে। তারপর বলে, ঘোড়া দেখার লাগি মজনুডারে আইতে কতি পারি। সে যেমুন আগে বলদ দেখতো, সেই রকুম ঘোড়াডার দেখাশুনা করবে।

শুনে রমিজা বলে, আরো একজন খাওয়ার মানুষ জুটলো।

জমির বলে, এমুন করি কথা কও ক্যানে কমলার মা? আমরা কি আগে একজন কামের পোলা রাখি নাই? এ তো নতুন কিছু না।

না। নতুন কিছু না। কিন্তু এহন যে সংসারের খরচ বাড়তিছে। কিছু তো টের পাও না।

জমির স্ত্রীর সঙ্গে তর্ক করে না। সে জানে নুন আনতে পান্তা ফুরায়ের মতো সংসারের হাল কত কষ্টে ধরে রেখেছে রমিজা। তার আয় বাড়েনি, কিন্তু জিনিসপত্রের দাম বাড়ছে হু হু করে। এর মধ্যে সবার প্রয়োজন মেটাচ্ছে রমিজা, কীভাবে মেটাচ্ছে সেটা খুলে না বললেও সে বোঝে। আগে তারা সবাই মিলে একসঙ্গে খেত, এখন সামনে বসে রমিজা সবাইকে খাওয়ায়, নিজে খায় পরে। অনেক বলেও একসঙ্গে খাওয়াতে রাজি করতে পারেনি সে। কেন সে একসঙ্গে খায় না, এটা জানতে তার বাকি নেই। সবাইকে খাওয়ানোর পর যা থাকে তাই খায় রমিজা। আজকাল প্রায় কিছুই থাকে না তার খাওয়ার জন্য, লক্ষ করেছে জমির। সেই জন্য সে ক্ষিধে থাকলেও বলে, আর দিও না। পেট ভরি গিছে।

জমিরের মুখ দেখে রমিজা বুঝতে পারে সে মিথ্যা কথা বলছে। ধমক দিয়ে বলে, আরেকটু খানি নিলি কিছু ক্ষতি হবে না।

জোর করেই তার পাতে সে তুলে দেয় মাছের টুকরো। কখনো বা মুরগির রান। জ্ঞান হওয়ার পর থেকেই সে দেখে এসেছে মুরগির রান, মাছের পেটি, এইসব পুরুষদের খেতে দিতে হয়। এমনকি থালা ভরে ভাতও। তার মেয়ে কি এ কথা জানে? এসব তো মায়ের কাছ থেকে শেখার বিষয় না। নিজের ভেতরের কেউ মেয়েদের বলে দেয় তাদের কতটুকু পাওনা। কমলার বয়স এমন কিছু না যে সংসারের সবকিছু বুঝে ফেলেছে সে। কিন্তু সে যে মেয়ে, পুরুষদের সমান না, এটা বোঝার জন্য কি বয়স বাড়ার দরকার হয়? ভেতর থেকে কেউ বলে দেয় না? তার বাবা তাকে বেশি আশকারা দিচ্ছে বলে কি তাদের মতো সংসারে সব মেয়ে যা বোঝে সে তা বোঝে না? বর্তমান নিয়ে না, মেয়ের ভবিষ্যতের কথা ভেবে রমিজা চিন্তায় পড়ে। ভবিষ্যৎ যে বর্তমানের অভ্যাসের ওপর দাঁড়িয়ে এটা কে না জানে? তাদের মেয়েটা কি জেনেশুনে অসুখী জীবনের দিকে পা বাড়িয়ে দিয়েছে?

কমলা যে তাকে নিয়ে মায়ের দুশ্চিন্তার কিছু বোঝে না, তা না। কিন্তু সে নিজের মতো চলতে চায়, যার মধ্যে সে কোনো দোষ খুঁজে পায় না। দোষ হলে বাবা তাকে বলতো, শাসন না করতে চাইলেও। কিন্তু এ পর্যন্ত তার কোনো কিছু নিয়ে আপত্তি তোলেনি বাবা। বরং তাকে উৎসাহ দিয়ে এসেছে। আমরা তার বাবার প্রশ্রয়ের কথা আগেও উল্লেখ করেছি। এই বর্ণনা এবং ব্যাখ্যা হছু পরেও আসবে। পাঠক কম বোঝে বলে তাকে চোখে আঙুল দিয়ে দেখাতে হবে, এ কথা ভাবা কিংবা বলা হচ্ছে না। গল্প বলার এটা নতুন তরিকা, এ কথা জানানো হচ্ছে। এর ফলে কি পাঠকের নিজের উদ্যম, পরিশ্রম কম করে দিয়ে তাকে অলস করে ফেলা হচ্ছে? মনে হয় না। তাকে লেখকের সমান অংশীদার করা হচ্ছে। কেউ কেউ অবশ্য বলেন লেখার পর লেখকের করার কিছু বাকি থাকে না, লেখককে বিদায় জানানো যায়। প্রতিটি বই লেখার পর লেখকের মৃত্যু হয়, বেশ নাটকীয়ভাবে বলা হয়েছে এ কথা। আমরা সেসব তত্ত্বকথা নিয়ে মাথা ঘামাচ্ছি না। আমাদের সামনে এখন একটা ঘোড়া, তাকে নিয়ে কাহিনি কীভাবে অগ্রসর হবে, সেই সমস্যা। সমস্যা এই জন্য যে ঘোড়াটা আমাদের চরিত্রদের নানা দিকে নিয়ে যেতে পারে। কিন্তু আমরা ঘোড়াটাকে বশে এনে নিজেদের পরিকল্পনা অনুযায়ী নিয়ে যেতে চাই। প্রতি গল্পেই এমন একটা ঘোড়া থাকে, দৃশ্যমান অথবা অদৃশ্য। তাকে বশে এনে পছন্দমতো কোথাও যাওয়া, তারপর বিরতি দিয়ে অন্য কিছু করা, এটাই তো করে এসেছে কথকেরা চিরকাল। আমরা নতুন কিছু করছি না।

এখন দেখা যাক জমিরের বাড়িতে আজ রাতের বেলা কী হচ্ছে। তার ঘরটা টিনের চারচালা, লম্বা ধরনের যার ভেতর তিনটা ভাগ। এক পাশের পার্টিশন দেওয়া অংশে তারা খাওয়া-দাওয়া করে। সেখনে থালা-বাসন, গ্লাস, পানির কলসি, দেয়ালে ঝোলানো শিকায় নানা ধরনের পাত্র আছে। বসার পিঁড়ি আছে

কয়েকটা, মাদুর পাতা আছে একপাশে। এখানে বসে তারা দুবেলা খায়, কখনো তিন বেলা। মেহমান আসলে হাঁড়ি-পাতিল, বাসন-কোশন সরিয়ে তাদেরও এখানে খেতে দেয়া হয়। রান্না হয় বাইরের কুঁড়েঘরে। চৌচালা ঘরের মাঝখানে একটা বড় পুরোনো খাট, কাঠের আলমারি, কাপড় রাখার আলনা, কোনায় মেঝেতে মরচে পড়া দুটো টিনের ট্রাঙ্ক যার ভেতরে কাপড়-চোপড়, অন্যান্য টুকিটাকি রাখা।

দেয়ালের হুকে কাপড় ঝোলানো। এই ঘরে জমির আর রমিজা শোয়। তৃতীয় ঘরটা আরেক পাশে, যেখানে মাঝারি সাইজের খাট, একটা পড়ার টেবিল, দুটো চেয়ার আর একটা আলমারি রয়েছে। এই অংশে কমলা আর তার ভাই রাজু থাকে আর পড়াশোনা করে। তিনটি অংশের মধ্যে যাতায়াতের জন্য দরোজা আছে। ঘরটা যে উপকরণ দিয়ে তৈরি আর ভেতরে যে আসবাব সেসব দেখে বলা যায় শ্রেণি হিসাবে জমিরের পরিবার মধ্যবিত্তের কাছাকাছি। কাছাকাছি কথাটার অর্থ হলো তাদের পরিবার যেকোনো সময় নিচের শ্রেণি অর্থাৎ নিম্নবিত্ত হয়ে যেতে পারে। কিছুক্ষণ আগে সংসার সম্পর্কে যে কথা বলা হয়েছে সেখানে এর প্রতি ইঙ্গিত ছিল। আরো স্পষ্ট করে বলা যায় যে কৃষি কাজ জমিরের জীবিকার উপায়, তার জন্য জমিরের পৈত্রিক সূত্রে পাওয়া দেড় বিঘা জমি আছে, এই সঙ্গে তালগাছের পুকুর, পুকুর, ভিটেবাড়ি, গোয়াল, আর বাঁশঝাড়।

দেড় বিঘায় সংসার চলে না বলে জমির আরো দেড় বিঘা জমি বর্গা নিয়েছে। জমিতে দুটো ফসল হয় আর কিছু শাকসবজি। পুকুরের মাছ বেশি হলে জমির সেসব ফড়িয়ার কাছে বিক্রি করে দেয়। জমির নিজে হাল বায় না, মাছও ধরে না। তার জন্য 'মুনি' রাখে সে যারা কাজভিত্তিক মজুরি পায় আর খাওয়া। রান্নায় সাহায্যের জন্য এক বিধবা থাকে তার বাড়িতেই, রান্নাঘরের এক পাশে, হামজুর মা বলে ডাকা হয় তাকে। হামজু কোনোদিন তার মাকে দেখতে আসে নাই। সে বেঁচে আছে না মরে গিয়েছে

তা হামজুর মা বলতে পারে না। গ্রামে এমন অনেক মা আছে, আজকাল শহরেও তাদের দেখা যায় ফুটপাতে থাকতে—যাদের ছেলেমেয়ে সংসার ছিল, যত জীর্ণই হোক ঘর ছিল, যেখানে রান্নার সময় উনুন থেকে ধোঁয়া উড়তো আর তখন তারা শাড়ির ময়লা আঁচল দিয়ে চোখ মুছতো।

তারা এখন নিঃসঙ্গ একাকী জীবনে শ্বাসটুকু ফেলবার আপ্রাণ চেষ্টায় সেই স্মৃতি স্মরণের সময় পায় না। তাদের কাছে অতীত মুছে গিয়েছে, ভবিষ্যৎ এক বিশাল অন্ধকার, কেবল বর্তমানের মোকাবেলা করে তাদের দিন-রাত কাটে। এটা অন্য প্রসঙ্গ, আমাদের কাহিনির সঙ্গে কোনো সম্পর্ক নেই এর। হামজুর মা নামের গ্রামের এক বয়স্কা গরিব নারীর কথার প্রসঙ্গে এসে গেল। কিন্তু কাহিনি বর্ণনায় সে আর আসবে না, এলেও অন্যের প্রসঙ্গে সামান্যভাবে। তারা কোনো কাহিনির প্রধান চরিত্র হয়নি, হওয়ার মতো বলে মনে করা হয় না। এই কাহিনি যাদের নিয়ে তারাও জীবনসংগ্রামে হিমশিম খায়, কিন্তু একেবারে পরাজিত, অসহায় হয়ে যায়নি।

শমশের শেখ জলডুবি মৌজার জোতদার। মৌজা গঠিত হয়েছে কয়েকটি গ্রাম নিয়ে, অবশ্য গ্রাম বড় হলে একটা গ্রাম নিয়েই একটা মৌজা হতে পারে। ভূমি রেকর্ড অনুযায়ী গ্রাম বলে কিছু লেখা নেই, আছে মৌজার নাম। জলডুবি এমনই একটা মৌজা যার মধ্যে কয়েকটি গ্রাম আছে। জলডুবিতে কয়েকজন জোতদার আছে যারা বড় কৃষক বলতে যা বোঝায় তারচেয়েও বড়। ভূমি আইন অনুযায়ী সর্বোচ্চ একশ বিঘার মালিকানা বৈধ। কিন্তু খুব কম কৃষকেরই একশ বিঘা আছে। যাদের অফিশিয়াল রেকর্ড অনুযায়ী একশ বিঘা লেখা তাদের প্রায় সবার তারচেয়ে বেশি জমি দখলে। আইনের ফাঁকফোকর দিয়ে সর্বোচ্চ সীমার ওপরে জমি দখলে রাখার কৌশল ব্যবহার করে তারা জোতদার হয়ে গিয়েছে অনায়াসে। অবশ্য এর জন্য কিছু

খরচাপাতি করতে হয়েছে তাদের।

অনেক জোতের মালিক হওয়ার জন্য তাদের জোতদার পদবি। জমিদারদের মতো তারা কৃষকদের জমি দিয়ে প্রজা হিসাবে খাজনা আদায় করে না। তারা ভূমিহীন বা ছোট আকারের কৃষকদের জমি বর্গা দিয়ে তিন ভাগ ফসলের দুই ভাগ নিয়ে নেয়। এই হারে ভাগ নেওয়ার বিরুদ্ধে অনেক আন্দোলন হয়েছে, কিন্তু জমির চাহিদা এত বেশি যে আন্দোলন করে বর্গাচাষিরা তাদের ফসলের ভাগ বাড়াতে পারেনি।

শমশের শেখের বাড়ির উঠানে মাঠ থেকে কেটে আনা চাষিদের আমন ধানের বস্তা একেক জায়গায় স্তূপের মতো করে রাখা হয়েছে। তার লোকজন সেসব মেপে দেখছে আর তারপর চাষিদের পাওনা এক ভাগ নিতে দিচ্ছে। মাপে কম কি বেশি হচ্ছে কিছুই বুঝতে পারে না বর্গাচাষিরা। কেউ মৃদু আপত্তি করলে ধমক দিয়ে থামিয়ে দেয়া হচ্ছে তাদের। ভয়ে তারা কখনো মুখ খোলে না। শমশের শেখ অন্দরমহলের বাড়ির বারান্দায় বসে সিগারেট খেতে খেতে ধান মাপা, গোলায় রাখা এইসব দেখছেন। আগের কালে জমিদাররা সিগারেট খেতেন না, আলবোলায় তামাক খেতেন গুরুক গুরুক শব্দ করে।

জমির আলির ধান মাপা হলে কর্মচারী খাতা নিয়ে তাঁকে কিছু বলার পর তিনি খাতায় নাম লেখা দেখে হাঁক দিয়ে বললেন, জমির মিয়া আসিছে? তারে আমার কাছে আসতি কও।

জমির তমিজের সঙ্গে তাঁর সামনে গিয়ে সালাম দিয়ে দাঁড়ায়। শমশের শেখ তার মাথা থেকে পা দেখে বলেন, কী মিয়া চাষবাসে মনে হতিছে খেয়াল নাই তুমার। গত বছরের তুলনায় এ বছর আমন ধানের ফলন কম হয়িছে ক্যান? বন্যা আসে নাই, খরা দেখা দেয় নাই, পোকামাকড়ের মড়ক লাগে নাই। তা হলি গত বছরের চাইতি এবার আমন ধান কম হয় ক্যামনে? নাকি রাতের আন্ধারে কিছু পাকা ধান সরায়ি ফেলিছ? ব্যাপারডা কী?

শুনে জমির আলি দাঁত দিয়ে জিভ কাটে। জড়োসড় হয়ে বলে, হুজুর চাষের বলদ ছিল না। তাই ভালো করি হাল দিতে পারি নাই।

শমশের শেখ অবাক হয়ে বলেন, হালের বলদ নাই, তা তুমি কৃষিকামে আছ ক্যান? অন্য কিছু করলিই পারো। তোমারে জমি বর্গা দিয়া আমি তো লস করতি পারি না।

জমির আলি তাড়াতাড়ি বলে, বলদটা হঠাৎ মরি গেল। টাকার অভাবে আরেকটা বলদ কিনতি পারি নাই। ইবারে কিনি ফেলবানে। ধার কর্জ করি হলিও কিনবানে।

শমশের শেখ বলেন, কিনবানে কতিছ এহন। আগে কেনো নাই ক্যানে? টাকার অভাব হলি আমার কাছে আসতি পারতা। আমি কি বেশি সুদ নিই অন্য মহাজনের তুলনায়? কত লোকে নিতেছে। সুদ নিয়া কেউ আপত্তি করে না। তা এহন লাগলি নিয়া যাতি পারো। মুনশিরে কয়ি দিতিছি। তারপর আফসোসের ভঙ্গিতে বলেন, ছি ছি আমি থাকতি ট্যাকার অভাবে বলদ কিনতি পারো নাই! এইডা একটা কথা হতি পারে? যাও দেরি না করি সামনের হাট থিকা বলদ কিনি আনি দেহাও আমারে। না হয় মনে করতি পারো, দেড় বিঘা জমি বর্গা তোমার কপালে আর লেখা নাই।

এখানে বলা দরকার, বর্গা প্রথা এখন ভালোভাবেই চালু আছে, বিশেষ করে দেশের উত্তরাঞ্চলে যেখানে জোতদারের সংখ্যা অনেক। এক সময় ভূমি সমস্যা নিয়ে পণ্ডিতেরা বেশ মাথা ঘামাতেন, বইপত্র লিখেছেন। ভূমি সংস্কারের কথাও বলেছে সরকার এবং দেশ স্বাধীন হওয়ার পর দু-দুবার ভূমি সংস্কার হয়েছে। কিন্তু ভূমির মালিকানায় খুব একটা পার্থক্য দেখা দেয়নি। অন্যদিকে ভূমিহীনদের সংখ্যা বেড়ে যাওয়ায় তারা গ্রাম ছেড়ে শহরমুখো হয়েছে। জমিদারি প্রথা উচ্ছেদ হয়েছে বটে, কিন্তু তাদের উত্তরসূরি হিসাবে জোতদাররা এখন বেশ বহাল তবিয়তে আছে। সুদখোর মহাজনরা শুধু ঋণের ব্যবসা না করে এখন দুটো